Vol. 45 | No. 3 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পরশুরাম ও তাঁর ‘গড্ডলিকা’

Volume	45
Issue	3
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	June 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v45i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i3.4
Pages	৮১-১০১
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পরশুরাম ও তাঁর ‘গড্ডলিকা’

বিশ্বজিৎ ঘোষ*

ছোটগাল্পিক, ভাষাবিজ্ঞানী, অভিধান-সংকলক, অনুবাদক, রসায়নবিদ, শিল্প-ব্যবস্থাপক ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত হলেও, কৌতুক রসস্রষ্টা হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম (১৮৮০-১৯৬০) সমধিক পরিচিত। রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুককে যাঁরা শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, পরশুরাম তাঁদের অন্যতম। তাঁর অনেক রচনাই বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিকের মর্যাদায় অভিষিক্ত। দেশ ও সমাজের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মানবকল্যাণ আকাঙ্ক্ষা তাঁকে সাহিত্যিক রূপে আবির্ভাবের প্রেরণা যুগিয়েছে। রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের মাধ্যমে তিনি সামাজিক ভণ্ডামি, সাংসারিক অসঙ্গতি ও ব্যক্তিক স্খলন তুলে ধরেছেন, কামনা করেছেন এইসব বিপন্নতা থেকে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি। এ কারণেই বহুমাত্রিক অসঙ্গতি ও ব্যঙ্গের স্রষ্টা হলেও তাঁর বড় পরিচয়— তিনি জীবনরসিক কথাকার, মনুষ্যত্বের রূপকার, নিরাসক্ত দৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞানমনস্ক শব্দশিল্পী। তাঁর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত শ্লেষ ও রঙ্গ-ব্যঙ্গের ধারাকে তিনি সম্পূর্ণ পাল্টে দিলেন। আত্মসমালোচনা ও অন্যকে আক্রমণ করার প্রবণতার পরিবর্তে বাংলা হাস্যরস-প্রধান সাহিত্যের ধারায় তিনি নিয়ে এলেন নতুন মাত্রা। পরশুরামের হাস্যরসমূলক সাহিত্যভুবন উদারতায় প্রসন্ন, বুদ্ধির দীপ্তিতে শাণিত, প্রগতিশীল সমাজচেতনায় সমৃদ্ধ এবং মনুষ্যত্ববোধে সমুজ্জ্বল। পরশুরামের এসব সাহিত্যবৈশিষ্ট্য তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা *গড্ডলিকা*-তে (১৯২৫) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবে পরশুরামের *গড্ডলিকা*-তে অনুপ্রবেশের পূর্বে তাঁর জীবনগঠন, মানসবৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যপ্রবণতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে আবশ্যক বলে বিবেচনা করি।

২

১৮৮০ সালের ১৬ই মার্চ, মঙ্গলবার[১], বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের কাছে বামনপাড়ায় মাতুলালয়ে রাজশেখর বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চন্দ্রশেখর বসু, আর মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী। সরকারি কর্মচারি হিসেবে চন্দ্রশেখর ডাকবিভাগ, জেলা

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কালেক্টরি, ইন্ডিগো কমিশন প্রভৃতি সংস্থায় চাকুরি করেন। অধ্যাত্মসাধক হিসেবেও সমকালে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ধর্মবিষয়ক গ্রন্থের লেখক রূপেও চন্দ্রশেখর খ্যাতি লাভ করেন। পিতার চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য রাজশেখর বসুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। উত্তরকালে পিতার মতো তিনিও বাঙালি বিদ্বৎসমাজে অর্জন করেন সমধিক পরিচিতি।

রাজশেখর বসুর ডাকনাম ফটিক। *গড্ডলিকা* প্রকাশের পর রাজশেখর বসু বা ফটিক নামকে ছাপিয়ে তিনি 'পরশুরাম' নামেই খ্যাতির শীর্ষে উপনীত হন। তবে 'পরশুরাম' নাম গ্রহণের কোন পূর্ব-পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। অকস্মাৎই ছদ্মনাম হিসেবে পরশুরাম নামটি তিনি গ্রহণ করেন। 'উৎকেন্দ্র' নামের এক সাহিত্য সংস্থার রবিবাসরীয় বৈঠকে 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে তিনি একটি গল্প পাঠ করেন। গল্পটি শুনে রায়-বাহাদুর জলধর সেন তা প্রকাশের জন্য *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রেরণ করতে আগ্রহী হন। কিন্তু রাজশেখর বসুর তাতে সায় ছিল না। তিনি স্বনামে তা প্রকাশ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। অগত্যা সামনে উপস্থিত 'পরশুরাম' নামে মিষ্টির দোকানের এক কর্মচারির নামই রাজশেখর বসু ছদ্মনাম হিসেবে গ্রহণ করলেন।[২] যেভাবেই গৃহীত হোক না কেন, পরিণতিতে এই নামটি রাজশেখর বসুর জীবনকেই যেন সার্থক করে তুলেছিল। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য—

> পিতৃদত্ত নামের উপর তর্ক চলে না। কিন্তু স্ব-কৃত নামের যোগ্যতা বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে। পরশু অস্ত্রটা রূপ ধ্বংসকারীর, তাহা রূপ সৃষ্টিকারীর নহে। পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে, লেখক বুঝি জখম করিবার কাজেই প্রবৃত্ত। কথাটা একেবারেই সত্য নয়।...আমি দেখিলাম তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।[৩]

রাজশেখর বসুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আরম্ভ হয় বিহারস্থ দ্বারভাঙ্গা-রাজ স্কুলে। ১৮৯৫ সালে উক্ত স্কুল থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি পাটনা কলেজে এফ এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৯৭ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে বি এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৯৯ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে রাজশেখর রসায়নশাস্ত্রে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এক বছর পর ১৯০০ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে রসায়ন শাস্ত্রে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯০২ সালে তিনি কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৯৭ সালে, রাজশেখর যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র, পটলডাঙ্গার দে-পরিবারের কন্যা মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। *শুশ্রূষা* নামক গ্রন্থ-প্রণেতা ডা. শ্যামাচরণ দে ছিলেন তাঁর দাদা-শ্বশুর। কবি বিষ্ণু দে পটলডাঙ্গার এই দে-পরিবারের অন্যতম সদস্য। রাজশেখর বসু ও মৃণালিনী দেবীর একমাত্র সন্তান এক কন্যা— নাম প্রতিমা। রাজশেখর বসুর জীবনসাধনা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে মৃণালিনী দেবীর সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বি এল ডিগ্রি লাভ করে রাজশেখর বসু অল্প কিছুদিন ওকালতি ব্যবসায় নিয়োজিত থাকার পর ১৯০৩ সালের প্রথম দিকে কেমিস্ট হিসেবে কলকাতার 'বেঙ্গল কেমিক্যালে' যোগ দেন। এক বছরের মধ্যে কেমিস্ট থেকে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ও সেক্রেটারি পদে উন্নীত হন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল মূলত রাজশেখর বসুর নিজের হাতে গড়া। একদিকে গবেষণার কাজ, অন্যদিকে ব্যবসা পরিচালনা— উভয় ক্ষেত্রেই রাজশেখর বসু অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। দীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের রসায়নবিদ হিসেবে তিনি কেমিস্ট্রি ও ফিজিওলজির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর মান উন্নয়নে অসামান্য সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন।[৪] ঔষধের নামকরণের ক্ষেত্রেও তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। ১৯৩৩ সালের ১লা জানুয়ারি রাজশেখর বসু বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার ও সেক্রেটারির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তবে টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার ও একজন ডিরেক্টর হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালে রাজশেখর বসুর কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় বুদ্ধদেব বসুর লেখায়। বুদ্ধদেব লিখেছেন—

> বহুকাল আগে, কোনো কাজে, বেঙ্গল কেমিক্যালের অ্যালবার্ট বিল্ডিং-এর দপ্তরে আমাকে একবার যেতে হয়েছিল। প্রয়োজন হল কর্মসচিবের সঙ্গে দেখা করার। নাম পাঠিয়ে দেবার আধ মিনিটের মধ্যে তাঁর কামরায় ডাক পড়ল আমার, দেড় মিনিটের মধ্যে কাজটির সমাধা হয়ে গেল। কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই সেই সাহিত্যিক-কর্মসচিবের চরিত্র আমি অনুভব করেছিলুম; শাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট-পরা প্রৌঢ়, মুখের ভাবটি প্রথমে একটু কঠোর মনে হয়, যাকে বলে 'কাজের লোক' সেই রকম তাঁর ধরন-ধারণ, কিন্তু ওরই মধ্যে প্রচ্ছন্ন অন্য কিছুর ঝিলিক দিচ্ছে— তাঁর স্বভাবের গভীরতর কোনো উদ্ভাস যেন! দেখে চমৎকৃত হলাম যে আপিসের খাতায় পরিষ্কার বাংলা হরফে তিনি স্বাক্ষর করলেন।[৫]

রাজশেখর বসুর কর্মময় জীবনের অপর উল্লেখযোগ্য কীর্তি বাংলা লাইনো-টাইপ উদ্ভাবন। *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং

রাজশেখর বসু-যতীনকুমার সেনের যৌথ-অবদান বাংলা লাইনো-টাইপ প্রকাশনার জগতে স্মরণীয় হয়ে আছে। লাইনো-টাইপের উন্নতি বিধানে রাজশেখর বসুর কর্মের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে গুরুদাস ভট্টাচার্যের অভিমত এখানে স্মরণীয়—

> ...এখানে তাঁর [রাজশেখর বসু] সৃজনমননের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বৈজ্ঞানিক কারিগরীর দিকে, অন্য চোখটি আবদ্ধ ছিল সাহিত্যিক কারুকার্যের দিকে। লাইনো-টাইপের মুদ্রণ সুচারু, সত্বর ও সুছাঁদে হবে— এই একদিকের চিন্তা, অন্যদিকের চিন্তা বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতা দ্রুত উন্নতি লাভ করবে।[৬]

স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই রাজশেখর বসুর মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও সাহিত্যচর্চার প্রবণতা সমানভাবে লক্ষ করা গেছে। উত্তরজীবনে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সাফল্যের পরিচয় রেখে যান। তবে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ৪২ বছর বয়সে— ১৯২২ সালে, *ভারতবর্ষ* পত্রিকায়। মুদ্রিত প্রথম লেখা একটি গল্প, নাম— 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। এরপর অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। স্ব-নামে লেখা তাঁর রচনাসমূহে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, মননশীলতা ও প্রগতিশীল চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে লেখা তাঁর গল্পগ্রন্থগুলো রস-রচনার অন্তর্গত। রাজশেখর বসুর প্রধান গ্রন্থসমূহের তালিকা এখানে উপস্থাপিত হল— *গড্ডলিকা* (১৩৩২), *কজ্জলী* (১৩৩৫), *চলন্তিকা* (১৩৩৭), *হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প* (১৩৪৪), *লঘুগুরু* (১৩৪৬), *কুটির শিল্প* (১৩৫০), *কালিদাসের মেঘদূত* (অনুবাদ, ১৩৫০), *ভারতের খনিজ* (১৩৫০), *বাল্মীকি রামায়ণ* (সারানুবাদ, ১৩৫৩), *কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত* (সারানুবাদ, ১৩৫৬), *গল্পকল্প* (১৩৫৬), *হিতোপদেশের গল্প* (১৩৫৭), *ধুস্তুরী মায়া ইত্যাদি গল্প* (১৩৬০), *কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প* (১৩৬০), *আনন্দবাঈ ইত্যাদি গল্প* (১৩৬১), *বিচিন্তা* (১৩৬২), *নীলতারা ইত্যাদি গল্প* (১৩৬৩), *চলচ্চিন্তা* (১৩৬৪), *চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প* (১৩৬৫), *পরশুরামের কবিতা* (১৩৬৬), *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* (১৩৬৮) ইত্যাদি। বাঙালির পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে তাঁর *চলন্তিকা* শীর্ষক অভিধানের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলোর মধ্যে *গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প, পরশুরামের কবিতা*— ইত্যাদি তিনি রচনা ও প্রকাশ করেন পরশুরাম ছদ্মনামে। অভিধান-সংকলনের মতো বাংলা পরিভাষা-সৃজন ও তা বিন্যাসে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিভাষা-সমিতির সভাপতি হিসেবে রাজশেখর বসু ঐতিহাসিক অবদান রেখে যান। তাঁর উদ্যোগী ভূমিকার ফলেই পরিভাষা-সমিতি পরিভাষা-কোষ প্রণয়নে সাফল্য অর্জন করে। রাজশেখর বসু ছিলেন সব্যসাচী লেখক। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই গদ্যশিল্পীর অনেক গ্রন্থ ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, কানাড়ি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়।

কর্ম ও সাহিত্যজীবনে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য রাজশেখর বসু লাভ করেন নানা উপাধি ও পদক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪০ সালে তাঁকে 'জগত্তারিণী পদক' এবং ১৯৪৫ সালে 'সরোজিনী পদক' প্রদান করেন। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি প্রদান করে সম্মানিত করেন। ১৯৫৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করেন ডি লিট উপাধি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দিয়ে সম্মান জানান ১৯৫৫ সালে। ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রদান করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি অর্জন করেন 'আকাদেমী পুরস্কার'।

১৯৬০ সালের ২৭শে এপ্রিল, সোমবার, অপরাহ্ণ ২.৪০ মিনিটে 'হাইপারটেনসিভ এ্যানকোপ্যালোপ্যাথি' রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজশেখর বসু মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের রস-রচনার একটি বিশেষ ধারাও যেন বন্ধ হয়ে যায়।

২.১

রাজশেখর বসু বাংলা রস-রচনার ধারায় সংযোজন করেন নতুন মাত্রা— একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ ও মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধন কীভাবে ঘটানো সম্ভব— বাঙালি পাঠককে তার পথ দেখিয়েছেন রাজশেখর বসু। তাঁর রসরচনাসমূহ মানবিক কল্যাণচেতনায় স্নিগ্ধ। সমাজ ও সংসারের চারপাশে অন্যায় ভণ্ডামি ছলনা কাপুরুষতা মিথ্যাচার উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবিরাম আদর্শহীনতা দেখে সত্যদর্শী রাজশেখর হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই হতাশা ও ক্ষুব্ধাবস্থা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তিনি বেছে নিয়েছেন রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের শাণিত আয়ুধ। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় বুদ্ধদেব বসুর অভিমত—

> Another writer in advanced years, and a most remarkable figure in our literature, is Rajsekhar Bose, whose work, first appearing under the pseudonym of 'Parasuram', is the nearest approximation in our language to comic writing as understood in England. ...this comic sketches are solidly built on satire, but the satire is gentle, without bitterness, indignation or utopian fury, so that his humour is never wanting in that more human quality of good humour, and

those whom he laughs at readily laughs with him....this style is superbly plain, with just a hint of the mock-heroic, just the shadow of an occasional wink; and knowing that dramatic exaggeration is inescapable in satire, he takes good care to avoid the excesses of enthusiasm, maintaining in his manner a business-like reserve, thus guarding himself against the usual vulgarities of the professional humorist.[৭]

বাংলা রসরচনার ধারায় পরশুরামের কৃতিত্ব এই যে, পাঠককে তিনি জোর করে হাসাতে চাননি। পূর্বসূরি অনেক লেখক থেকে পরশুরাম এই সূত্রেই স্বকীয়তা দাবি করতে পারেন। কাহিনীর অনিবার্য প্রয়োজনে কৌতুক-উপাদান তাঁর পাঠককে নির্মল আনন্দ দিয়েছে, সহজাত প্রবণতায় তারা ফেটে পড়েছে নির্দোষ হাসিতে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন— "বাংলার যথার্থ সুরসিক লেখকের সংখ্যা এত কম যে, এক অঙ্গুলির পর্বে গণিয়া শেষ করা যায়। অনেক তথাকথিত রসার্ণব ও রসোপাধ্যায়ের অট্টহাস্যের দাপটে কাঠ ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায়, কিন্তু জীবন্ত মানুষের মুখে হাসি ফুটে না।... মোট কথা, যেখানে হাসাইবার উৎকট উদ্দেশ্য উলঙ্গ হইয়া পড়ে, সেইখানেই হাস্যরসের সপিণ্ডকরণ হয়। আর যেখানে রস-সৃষ্টি তাঁহার মনের আনন্দ উদ্দেশ্যকে ছাপাইয়া যায়— সেইখানেই তাহা সার্থক। পরশুরামের গল্পে...এই সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়।"[৮]

পরশুরামের শিল্পিমানসে বিজ্ঞানীর নির্মোহ নির্মল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রসস্রষ্টার কল্পনাপ্রিয়তা ও কল্যাণেচ্ছার সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের গভীর সমন্বয় পরশুরামের গল্পসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানীর নিষ্ঠা ও নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন; অপরদিকে সেই পর্যবেক্ষণকেই রসের আরকে নিষিক্ত করে পাঠককে তিনি উপহার দিয়েছেন। বস্তুত, তাঁর রসসৃষ্টি বিজ্ঞানচেতনা থেকে উদ্ভূত, পক্ষান্তরে তাঁর বিজ্ঞানবোধ স্থিতি লাভ করেছে রসচেতনায়। পরশুরামের রসসাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক কোনো রচনা নয়। সমাজসংস্কার ও মানবকল্যাণ-আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর সংস্কারচেতনা ও মানবকল্যাণ-আকাঙ্ক্ষার উপজাত সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর রসসাহিত্য-ভুবন। তথাপি এই উপজাত সৃষ্টিই তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বাংলা রম্যসাহিত্য বা রসরচনায় পরশুরাম যে মাত্রা সঞ্চার করেছেন, আজো তাঁর ঔজ্জ্বল্য অম্লান, এখনো তিনি উত্তরাধিকারহীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী রসশিল্পী। এ— প্রসঙ্গেই স্মরণ করা যায় বুদ্ধদেব বসুর এই অভিমত— "তাঁর [পরশুরাম] কৌতুক...বিশুদ্ধ ও সর্বজনের

পক্ষে প্রীতিকর। ...প্রমথ চৌধুরী একবার লিখেছিলেন : 'মানুষ খারাপ বলে দুঃখ করি না, মানুষ দুঃখী বলে মন-খারাপ করি'; অথচ, মানুষ যে খারাপ, এই অতি সাধারণ সত্যটা অসহ্য হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত বিদ্রূপের জমি উর্বর হতে পারে না। —কিন্তু যা হয়নি তা কেন হয়নি, এই দূরকল্পনা আমার অভিপ্রায়ের বাইরে, আপাতত এ-কথা ভেবে দুঃখ না-করা অসম্ভব যে কৌতুকরচনায় পরশুরামের উত্তরাধিকারী বাংলা সাহিত্যের দিগন্তে এখনো দেখা যাচ্ছে না।"[৯]

পরশুরামের রসরচনাকে দু'ভাবে বিন্যস্ত করা যায়— একদিকে হিউমার বা কৌতুক, অন্যদিকে স্যাটায়ার বা বিদ্রূপ। তবে উভয় এলাকাতেই তাঁর মননশীলতা বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৭-১৯১৯), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)-এর সঙ্গে পরশুরামের স্বকীয়তা এ সূত্রেই বিশেষভাবে বিবেচ্য। পরশুরামের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষের মধ্যেও সবসময় ক্রিয়াশীল থাকে হার্দিক ঔদার্য ও কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষা। তাই তাঁর স্যাটায়ার তীব্র ঝাঁঝালো আক্রমণের মাঝেও নিয়ে আসে প্রসন্নতার হাওয়া। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত। তিনি লিখেছেন— "তাঁহার [পরশুরাম] হাস্যরসের মধ্যে একটা স্বতঃউৎসারিত প্রাচুর্য্য ও অনাবিল বিশুদ্ধি আছে। তাঁহার রসিকতার প্রবাহ বুদ্ধির ব বপ্রক্রীড়ায় ঘোলাটে হয় নাই, সূর্যোকরোজ্জ্বল নির্ঝরের ন্যায় সহজ, সাবলীল নৃত্যভঙ্গে হাসির ঝিকিমিকি ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া চলিয়াছে।"[১০] পরশুরামের ব্যঙ্গ বুদ্ধির দীপ্তি ও মনুষ্যত্ববোধের অঙ্গীকারে উজ্জ্বল। উত্তরকালে সৈয়দ মুজতবা আলীর (১৯০৪-১৯৭৪) রসরচনায় পরশুরামের এই প্রবণতার সীমিত সাদৃশ্য আমরা লক্ষ করি। মুজতবা আলীর রচনায়ও নির্মল অট্টহাস্যের অন্তরালে সব সময় প্রবাহিত হয় মানবজীবনের অন্তহীন অশ্রুপাত ও শুভচেতনা।[১১]

৩

গড্ডলিকা পরশুরামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থে মোট পাঁচটি রম্যগল্প আছে। গল্পগুলো হচ্ছে— 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'চিৎসা-সংকট', 'মহাবিদ্যা', 'লম্বকর্ণ' এবং 'ভুশণ্ডীর মাঠে'। গ্রন্থ-অন্তর্ভূত পাঁচটি গল্পেই রসসাহিত্যিক হিসেবে পরশুরামের স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। কৌতুকরস সৃষ্টিতে পরশুরামের দুর্লভ শক্তির স্বাক্ষর যেমন এখানে আছে, তেমনি আছে সমাজ ও সংসারের কল্যাণ

কামনায় তাঁর আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষার কথা। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় য লিখেছেন— "চরিত্রের আচার-ব্যবহার, সংলাপ, পরিবেশ প্রভৃতি কৌতুককর সন্নিবেশে তাঁর গল্পগুলি শুধু রসিকতা-প্রিয় পাঠকের সাময়িক চিত্তবিনোদন করেই মুছে যায়নি। অসাধারণ অভিজ্ঞতা, কৌতুকরস সৃষ্টির দুর্লভ শক্তি, বুদ্ধির উজ্জ্বলতা কোথাও কোথাও অসামান্য ব্যঙ্গরস পরিবেশনে তাঁর *গড্ডলিকা* ...রুচিমান পাঠকসমাজে এখনো অত্যন্ত আকর্ষণের বস্তু হয়ে আছে। হাস্যকৌতুককে ক্লাসিক পর্যায়ে তুলে ধরার সমস্ত গৌরব তাঁর প্রাপ্য।"[১২] এ কারণেই অজিতকুমার ঘোষ মন্তব্য করেছেন— "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসের লেখক হইতেছেন পরশুরাম।"[১৩]

গড্ডলিকা-র গল্পপঞ্চক অবারিত ও আনন্দকর কৌতুকরসে জারিত। এখানে রঙ্গ-ব্যঙ্গ সাবলীল ও অনায়াসজাত, হাস্যরস মৌলিক ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়বহ। পরশুরামের চরিত্রসমূহ এতই বাস্তব ও জীবন্ত যে, সেগুলো হয়ে উঠেছে পাঠকের অফুরন্ত আমোদের উৎস। সূচনাসূত্রেই বলা হয়েছে, পরশুরামের গল্পে বিদ্রূপের পরিবর্তে আছে বহুমাত্রিক অসঙ্গতি থেকে মুক্তির বাসনায় নির্মল হাস্যরসের নির্ঝর। এ প্রসঙ্গেই বিশেষভাবে স্মরণীয় অজিতকুমার ঘোষের মন্তব্য। তিনি লিখেছেন—

> পরশুরামের ব্যাপক জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ হইল তাঁহার অদলীয় অপক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁহার হাসির আঘাত কখনো তীব্র ও কঠোর হয় নাই, এবং সেই আঘাতের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিমত কখনো ধরা পড়ে নাই। কোথাও শ্লেষের দু-একটি কাঁটা এবং কোথাও বা ব্যঙ্গের ঈষৎ জ্বালাই রহিয়াছে মাত্র, কিন্তু সেগুলির লক্ষ্য বহুবিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী সমাজ চরিত্র। কচি ও বুড়া, সেকেলে ও একেলে সকলকে লইয়াই তিনি একটু হাস্য পরিহাস করিয়াছেন। সেজন্য সকলেই একটু আধটু ঘা ও খোঁচা খাইয়াছেন বটে, কিন্তু কাহারও আপত্তি ও অভিযোগ করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই।[১৪]

গড্ডলিকা-র গল্পসমূহে পরশুরাম হাসির অন্তরালে তুলে ধরেছেন বাঙালির সামাজিক ও সাংসারিক জীবনের অনেকান্ত অসঙ্গতি ও অতল বেদনার কথা।[১৫] হাসির আবরণটুকু সরিয়ে রাখলে এসব রচনাও তাঁর অন্যান্য 'সিরিয়াস' রচনার মতোই গুরুত্ববহ শিল্পকর্ম হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। হাসি ও কৌতুক এখানে মানবজীবনের না-বলা অনেক বেদনা ও বিপন্নতার ভিন্নতর প্রকাশ মাত্র। মানবচরিত্রের এই স্বতন্ত্র ভাষ্য ও রূপ অঙ্কনই পরশুরামের সবিশেষ কৃতিত্ব। পরশুরামের *গড্ডলিকা*-র চরিত্রসমূহ কেবল হাস্যরসের খোরাক জোগায় না, বরং তা মানুষের চিরকালীন আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই ব্যক্ত করে। জাতীয় জীবনের পরাভব ও

গভীর মর্মযাতনার সাগর মন্থন করে পরশুরাম হাস্যআয়ুধ নিয়ে *গড্ডলিকা*-য় আবির্ভূত হয়েছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে এ বিষয়টি চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। তিনি লিখেছেন—

> বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছোটগল্পের অন্যতম স্বর্ণযুগ। চারিদিকে তখন মানুষের সর্বাত্মক বিকৃতি ফেটে পড়েছে; সমাজ, ধর্ম, সংস্কার এবং পারিবারিক জীবনের ভিত্তি নড়ে উঠেছে। পুঞ্জীভূত গ্লানিতে জাতি তখন পঙ্কস্নান করছে, মানুষের লোভের ষড়যন্ত্রে গড়া দুর্ভিক্ষে সমস্ত বাংলাদেশ নরকে পরিণত হয়েছে, আর কালোবাজারীরা মুণ্ড শিকারীর ভূমিকা নিয়েছে। ওদিকে, ইংরেজ সরকারের হৃদয়হীন উদাসীনতা, আগস্ট-বিপ্লব দমন করবার নামে সীমাহীন নিষ্ঠুরতা...। এই অসহ্য যন্ত্রণার চাবুকে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল সেদিনের বাঙ্গালী। লেখক কলমের মুখে ক্ষিপ্ত বেদনার বজ্রদ্যুতি সঞ্চার করেছিলেন। পরশুরাম তখন যুগের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেননি...। বাংলা সাহিত্যে পরশুরামের আবির্ভাব এই বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে।[১৬]

—কাজেই দেখা যাচ্ছে, *গড্ডলিকা*-র গল্পপঞ্চকে পরশুরামের কৌতুক রঙ্গ ও হাসি, জাতীয় জীবনের বিপর্যয়সম্ভূত বাঙালিচিত্তের গভীর মর্মযাতনা থেকে উদ্ভূত। *গড্ডলিকা*-র নির্মল হাস্যরসের অন্তরালে জাতীয় চিত্তের বিপন্নতার এই প্রতিভাস নির্মাণ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১

গড্ডলিকা-র প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার বেচা-কেনা নিয়ে যে জুয়াচুরি ও প্রতারণা আধুনিককালের নৈমিত্তিক ঘটনা, 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে সে-প্রবণতার উপর তীব্র কশাঘাত করা হয়েছে। বিষয়-নির্বাচন, চরিত্র-চিত্রণ, ভাষা-ব্যবহার এবং গঠনকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' শিল্পসফল উৎকৃষ্ট রসরচনা হিসেবে পরিণতি লাভ করেছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী একজন তান্ত্রিক সাধু। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' কোম্পানি। কোম্পানির শেয়ার বাজারে ছাড়ার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর কোম্পানিতে মানিকজোড় হিসেবে যোগ দিয়েছেন গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া নামের এক বড় ব্যবসায়ী। এই দুই অসৎ ব্যক্তির হাতে পড়েছেন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিচক্ষণ রায় সাহেব তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। সব টাকা আত্মসাৎ করে ডুবে-যাওয়া কোম্পানি তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে শ্যামানন্দ ও গণ্ডেরিরাম গা ঢাকা দেবে— এই হচ্ছে আলোচ্য গল্পের ঘটনাংশ।

'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-সমাপ্তির পাঁচ বছরের মধ্যে। যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য গল্প রচনা করে, হাস্যকৌতুকের অন্তরালে পরশুরাম তাঁর সুগভীর সমাজবোধ ও কালচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী এবং গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়ার ভণ্ডামি ও প্রতারণা সামাজিক বিপন্নতা ও অসঙ্গতিরই শব্দছবি। এই বিপন্নতা ও অসঙ্গতি থেকে মুক্তি ও সঙ্গতির জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষাও গল্পের অন্তর্প্রবাহে ক্রিয়াশীল। অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি সন্ধান পরশুরামের রসসাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। স্মরণ করা যাক, এ প্রসঙ্গে, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের অভিমত—

> কমেডির উৎস হইল অসঙ্গতি, আর শিল্পকলার প্রধান লক্ষণ সুসঙ্গতি। এমন দিন ছিল যখন লিমিটেড কোম্পানির অস্তিত্বই কেহ কল্পনা করে নাই; আবার হয়তো এমন দিন আসিবে যখন লিমিটেড কোম্পানির কথা লোকে ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু প্রবঞ্চনা, চাতুরি, অন্ধবিশ্বাস লুপ্ত হইবে না এবং মানুষের বুদ্ধি নিত্য নূতন ফন্দি আঁটিবে। অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি বাহির করা, উদ্ভটকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তোলা, সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্যের সম্মিলন করা কমিক শিল্পের কৃতিত্ব। এই গল্পের স্রষ্টা সেই কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন।[১৭]

শ্যামানন্দ ও গণ্ডেরিরাম পরশুরামের দুটি অসামান্য চরিত্র। জুয়াচোর শ্যামানন্দ ও ধনকুবের গণ্ডেরিরাম অসৎ ভণ্ড অভিন্ন চরিত্র। অ্যাটর্নি অটলের সংলাপে সে-কথাই অভিব্যক্ত— 'আমাদের শ্যাম-দা ও গণ্ডেরি-দা যেন মানিকজোড়'। ভণ্ডামি, মিথ্যা বলা, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করা, অন্যকে প্রতারণা করা— এসব বৈশিষ্ট্য উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। তবু দুজনের মধ্যে সূক্ষ্ম একটি পার্থক্যও আছে। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী বাটপাড় হলেও ভীরু, তাই তার শঠতার পরিকল্পনাও সীমিত। কিন্তু গণ্ডেরিরাম দুঃসাহসী— তার শঠতার সীমাও হাজার টাকার গণ্ডি পেরিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকায় উন্নীত। তার-ই কূটকৌশলে কারো এক টাকা খরচ না করেই মুহূর্তেই আড়াই লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রির পরিকল্পনা করা হয়। স্বয়ং শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী গণ্ডেরিরামের ধাপ্পাবাজির প্রস্তাবে বিস্মিত হয়ে যান।

ব্রহ্মচারী উপাধি গ্রহণ করলেও শ্যামানন্দ বকধার্মিক, ভণ্ড ও প্রতারক। ধর্মের প্রতি তার এক বিন্দুও বিশ্বাস নেই— ধর্ম তাঁর কাছে লোকদেখানো বিষয় মাত্র। ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনে তার উদ্ভাবনী শক্তি বিস্ময়কর। পরশুরামের ভাষাতেই দেখা যাক শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর ধর্ম-কর্মের স্বরূপ— "শ্যামবাবু বলিলেন- 'গঙ্গাজলের বোতলটা আন্, আর খাতাপত্রগুলো একটু ঝেড়ে-মুছে রাখ, যা ধুলো

হয়েছে।' বাঞ্ছা একটা তামার কুপি আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তারপর টেবিলের দেরাজ হইতে একটি সিন্দুর-চর্চিত রবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিলেন। স্ট্যাম্পে ১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে, সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়।"[১৮]

কেবল শ্যামানন্দ নয়, শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই ধর্মকে প্রধানত অর্থ-আত্মসাতের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করে ধর্মের জয়ঢাক বাজিয়ে আত্মস্বার্থ উদ্ধারেই তারা ব্যস্ত। কোম্পানির জন্য অটল যে মেমোরেন্ডম তৈরি করেছে, সেখানেই আছে ধর্ম-ব্যবসায়ের পরিচয়। তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে কীভাবে অর্থ আত্মসাৎ করা হবে, সেজন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে এভাবে— "...মোট কথা, তীর্থযাত্রী আকর্ষণ করিবার সর্বপ্রকার উপায়-ই অবলম্বিত হইবে। স্বয়ং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী সেবার ভার লইবেন। যাত্রিগণের নিকট হইতে যে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, তাহা ভিন্ন আরও নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে। দোকান, হাট, বাজার, অতিথিশালা, মহাপ্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদ্‌ভিন্ন by-product recovery-র ব্যবস্থা থাকিবে। সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলিতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগসমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিউ-স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে।" কোম্পানির মেমোরেন্ডম-এর এই অংশ পাঠেই বোঝা যায়, শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী ও তার অনুসারীদের ধর্মপালনের মৌল উদ্দেশ্য। স্বপনাদেশ ও দেবী-মন্দিরকে শেয়ার বাজারের বিষয় বানিয়েছেন শ্যামানন্দ, আর সে-প্রয়াসকে সার্থক করে তুলেছেন গণ্ডেরিরাম।

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও শ্যামানন্দ ও গণ্ডেরিরামের মতো অর্থলোভী। অল্প টাকা বিনিয়োগ করে ঘন ঘন সভা ডেকে ডিরেক্টর ফি হিসেবে কিছু অর্থ তিনি আত্মসাৎ করতে ব্যস্ত। অর্থলোভে তার বুদ্ধি-বিবেচনা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই অগ্র-পশ্চাৎ না-ভেবে শুধু লোভের বশবর্তী হয়ে পেনশনের টাকা দিয়ে শ্যামানন্দের ৩২০০ টাকা শেয়ারের দায় তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। অতল জলে ডুবে-যাওয়া শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড তার একার ঘাড়ে চেপে বসেছে। তিনকড়ি বাবুর এই পরিণাম পরশুরাম তুলে ধরেছেন এভাবে—

তিনকড়ি । আরো টাকা যাবে? সে কত?

অটল । আপনার একলার নয়। প্রত্যেক অংশীদারকেই শেয়ার পিছু ফের দু-টাকা দিতে হবে। আপনার পূর্বের ২০০ শেয়ার ছিল, আর শ্যাম-দার ১৬০০ আজ নিয়েছেন। এই ১৮০০ শেয়ারের ওপর আপনাকে ছত্রিশশ' টাকা দিতে হবে।...

তিনকড়ি । তোমাদের কত গেল?

গণ্ডেরি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন–'কুছ্‌ভি নহি, কুছ্‌ভি নহি! আরে হামাদের ঝড়তি-পড়তি শেয়ার তো সব শ্যামবাবু লিয়েছিল— আপ আপ্‌নেকে বিক্‌কিরি কিয়েছে।'

তিনকড়ি । চোর-চোর-চোর। আমি এখনি বিলেতে কোল্ডহাম সাহেবকে চিঠি লিখছি—

অটল । তবে আমরা এখন উঠি। আমাদের তো আর শেয়ার নেই, কাজেই আমরা এখন ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন। চল গণ্ডেরি।

তিনকড়ি । অ্যাঁ–

গণ্ডেরি । রাম রাম!

গণ্ডেরিরাম আর শ্যামানন্দের হাতে সর্বস্বান্ত তিনকড়িবাবুর এই পরিণতির মধ্য দিয়েই 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্প সমাপ্ত হয়েছে। শেয়ার-বাজার এমন এক জায়গা যেখানে বহুলোক প্রবঞ্চিত হয়, আর লাভবান হয় দু'চারজন। যারা লাভবান হয়, তারা সবাই যে ঠগ ও অসৎ তা নয়। তবে ঠগ, অসৎ আর ধূর্তদের রাতারাতি অর্থ-আত্মসাতের উত্তম জায়গা শেয়ার-বাজার। আলোচ্য গল্পে শেয়ার বাজারের এই চরিত্র রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের মধ্য দিয়ে চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধিদীপ্ত এবং কুশলী উপস্থাপনার জন্য গল্পকাহিনী সৃষ্টি করেছে হাসির নির্ঝর। পরশুরামের গল্পে অর্থলোভী অসৎ ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী মুনাফাবাজ ব্যক্তি, অসাধু মারোয়াড়ী প্রভৃতি চরিত্রের পৌনঃপুনিক আগমন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নাম ও পরিচয়ে এরা ভিন্ন হলেও, উদ্দেশ্যে অভিন্ন। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' এ ধারার-ই একটি রসোত্তীর্ণ গল্প। উপর্যুক্ত শ্রেণীর অসৎ মানুষদের উপর আলোচ্য গল্পে বর্ষিত হয়েছে কৌতুকাশ্রিত শ্লেষ এবং ব্যঙ্গাত্মক বিদ্রূপ। সন্দেহ নেই, শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়— এসব চরিত্র পরশুরামের উজ্জ্বল সৃষ্টি।

'চিকিৎসা-সংকট' *গড্ডলিকা*-র দ্বিতীয় গল্প। রসরচনা হিসেবে এটি পরশুরামের অনন্য সৃষ্টি। ছোট ছোট সামাজিক অসঙ্গতি মানুষের জীবনকে কীভাবে দুর্বিষহ করে তোলে, পরশুরামের গল্পে পৌনঃপুনিকভাবে সে-ছবি ফুটে উঠেছে। এ সূত্রেই

'চিকিৎসা-সংকট' বিশেষভাবে বিবেচ্য। নন্দবাবু চলন্ত গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান। তেমন গুরুতর আহত না হলেও অপরিচিত সহযাত্রীদের অযাচিত উপদেশ এবং ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির চিকিৎসা, আলোচ্য গল্পে হাসির খোরাক জুগিয়েছে। হাসি প্রবলতর রূপ নিয়েছে গল্পের সমাপ্তিতে, যেখানে নন্দবাবুর সব ধরনের চিকিৎসা লেডি ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। চিকিৎসা-বিভ্রাটের এই কাহিনীতে চিকিৎসকের মুদ্রাদোষ অর্থগৃধ্নুতা ও রোগী টানাটানির প্রবণতা সরস হাসির সৃষ্টি করেছে। গল্পের মিলনাত্মক পরিণতি হাস্যরস সৃষ্টির বিচারে খুব-ই সঙ্গত হয়েছে। প্রসঙ্গত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের অভিমত স্মরণ করা যায়—

নন্দ'র অলীক অসুখের চিকিৎসা-মৃগয়ার শেষ পরিণতি লেডি ডাক্তারের চেম্বারে; খুব স্বাভাবিকভাবেই এই গোবেচারী লোকটি লেডি ডাক্তারের বিপুলা ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছে এবং বিবাহের উলুধ্বনির মধ্যে সংকটের মুক্তি পাইয়াছে। এই পরিণতির মধ্যে ঈষৎ করুণরসেরও স্পর্শ আছে। ...বিপুলানন্দের মিলনে সান্ধ্য আড্ডাটি ভাঙ্গিয়া গেল। মোট কেনা হইল বটে, কিন্তু বন্ধুদের আর সেই মোটরে বেড়াইবার সুযোগ হইল না।[১৯]

বার্নার্ড শ'য়ের *The Doctor's Dilemma* নাটকের ঘটনাংশের সঙ্গে 'চিকিৎসা সংকট' গল্পের বেশ মিল আছে। ওই নাটকে বার্নার্ড শ' ঠাট্টা করে বলেছেন— ডাক্তাররা রোগের চিকিৎসা যেমন করেন, তেমনি নতুন নতুন রোগ উদ্ভাবনও করেন। নিজের উদ্ভাবিত কল্পিত রোগের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হলে তাঁরা ক্ষুব্ধ হন। পরশুরামের গল্পেও আমরা বার্নার্ড শ'য়ের অভিমতের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 'চিকিৎসা-সংকট'-এ চিকিৎসকদের অজ্ঞতা যেমন সীমাহীন, আত্মবিশ্বাসও তেমনি প্রচণ্ড। সবাই নিজেদের মহিমা প্রকাশে ব্যস্ত— সকলের-ই মূলধন ভণ্ডামি ও ধাপ্পাবাজি। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, ইউনানি— সকল ধরনের চিকিৎসক-ই ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারে সমান দক্ষ। এদের ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতি ও অজ্ঞতা, লেখক অতি অল্প কথায় হাস্যরসের আধারে উপস্থাপন করেছেন। 'হাস্যরসজনক পরিস্থিতির উদ্ভাবন-নৈপুণ্যের' উপর-ই হাস্যরস-প্রধান সাহিত্যের শিল্পসার্থকতা নির্ভর করে।[২০] পরশুরামের গল্পে, বিশেষত *গড্ডলিকা*-র গল্পগুলোতে, হাস্যরসমূলক পরিস্থিতির উদ্ভাবন-নৈপুণ্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'চিকিৎসা-সংকট' হাস্যরস সৃজনে সমর্থ হলেও, তা গভীরতর কোনো জীবনদর্শনের কথা ব্যক্ত করে না। এখানে হাস্যরসের উৎস স্থূল ও সরস কৌতুককর ঘটনাধারা। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এর মতো আলোচ্য গল্প, গভীরতর কোনো সমাজবাস্তবতা বা ব্যক্তিসংকটের কথা প্রকাশ করতে সমর্থ হয় নি। এ প্রসঙ্গেই

প্রণিধানযোগ্য, 'চিকিৎসা সংকট' গল্পের শিল্প-সার্থকতা বিবেচনার প্রশ্নে, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের অভিমত— "চিকিৎসা সংকট' সুগঠিত, সুলিখিত সরস গল্প হইলেও ইহাকে প্রথম শ্রেণীর রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; কারণ ইহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ খুব ভাসা-ভাসা রকমের। কয়েকজন চিকিৎসকের মুদ্রাদোষ, অর্থলোভ, দাম্ভিকতা এবং রোগীর অসহায়তা বা অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া ধাপ্পা দেওয়ার অতিমোটা কৌশলের ঝকঝকে বর্ণনা অতিক্রম করিয়া ইহা কোন গভীর রহস্যে পঁহুছিতে পারে নাই বা কয়েকটি রেখার টানে কোনো চরিত্রকে সজীব করিতে পারে নাই।"[২১]

গড্ডলিকা-র তৃতীয় গল্প 'মহাবিদ্যা'। হাস্যরস সৃজনেই লেখক এখানে অধিক মনোযোগী বলে মনে হয়। হাস্যরসের অন্তরালে গভীরতর জীবনদর্শনের কোনো প্রকাশ 'মহাবিদ্যা'-য় নেই। মহাবিদ্যায় সাধারণ মানুষকে দীক্ষিত করে তোলাই মহাবিদ্বান জগদ্‌গুরুর একমাত্র লক্ষ্য। মহাবিদ্বানরা একজোট হয়ে কাজ করতে চায়, বিদ্যাচর্চার আধারে তাদের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার। মহাবিদ্বানদের এই উদ্দেশ্য গল্পের অন্যতম চরিত্র জগদ্‌গুরুর সংলাপে অভিব্যক্ত— "দেখ বাপু, পৃথিবীর ধনসম্পদ যা দেখছ তার একটা সীমা আছে, বেশি বাড়ানো যায় না। সকলেই যদি সমান ভাগে পায়, তবে কারো পেট ভরে না। যে জিনিস সকলেই অবাধে ভোগ করতে পারে, সেটা আর সম্পত্তি বলে গণ্য হয় না। কাজেই জগতের ব্যবস্থা এই হয়েছে যে, জনকতক ভোগ-দখল করবে, বাকি সবাই যুগিয়ে দেবে। চাই গুটিকতক মহাবিদ্বান আর একগাদা মহামূর্খ।" ভণ্ডামি আর মিথ্যাচার, যা পরশুরামের বিভিন্ন গল্পে পাওয়া যায়, আলোচ্য গল্পেও হাস্যরস সৃষ্টির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরশুরামের হাস্যরসপ্রধান গল্পের ধারায় 'লম্বকর্ণ' একটি উজ্জ্বল নির্মাণ। লম্বকর্ণ মানুষ নয়, মূক পশু— বেওয়ারিশ এক ছাগল। কিন্তু আলোচ্য গল্পে লম্বকর্ণ হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট এক চরিত্র। লম্বকর্ণের আচার-আচরণই আলোচ্য গল্পে হাস্যরসের ঝর্ণা বইয়ে দিয়েছে। রায় বাহাদুর বংশলোচনবাবু বেলেঘাটার খালের ধারে বৈকালিক ভ্রমণের সময় লম্বকর্ণকে বেওয়ারিশ হিসেবে পেয়ে বাসায় নিয়ে আসেন। বাড়িতে আনার পর লম্বকর্ণের আচরণ অসীম বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। বংশলোচনবাবুর জীবনের গতিই পাল্টে গেল লম্বকর্ণের আগমনে। লম্বকর্ণের নানা কর্ম লেখকের বর্ণনার নৈপুণ্যে আলোচ্য গল্পে হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। যেমন—

ক. ছাগল বিশ্বাস করিল না, পকেট তল্লাশ করিতে লাগিল। বংশলোচন নিরুপায় হইয়া চামড়ার সিগার-কেসটি খুলিয়া ছাগলের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন— 'না বিশ্বাস হয়, এই দেখ্ বাপু।' ছাগল এক লম্ফে সিগার-কেস কাড়িয়া লইয়া চর্বণ আরম্ভ করিল। রায়বাহাদুর রাগিবেন কি হাসিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন– 'শ্-শালা।'

খ. আবার তাহার [লম্বকর্ণ] ক্ষুধা পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া একবার তদারক করিয়া লইল। ফরাশের এককোণে একগোছা খবরের কাগজ রহিয়াছে। চিবাইয়া দেখিল, অত্যন্ত নীরস। অগত্যা সে গীতার তিন অধ্যায় উদরস্থ করিল। গীতা খাইয়া গলা শুখাইয়া গেল। একটা উঁচু তেপায়ার উপর এক কুঁজা জল আছে, কিন্তু তাহা নাগাল পাওয়া যায় না। লম্বকর্ণ তখন প্রদীপের কাছে গিয়া রেড়ির তেল চাখিয়া দেখিল, বেশ সুস্বাদু। চকচক করিয়া সবটা খাইল। প্রদীপ নিবিল।

লম্বকর্ণ গল্পের পরিণতিতে ভাবাবরোহ বা অ্যান্টি-ক্লাইমেক্সের সঙ্গে আয়রনি বা বিপরীত লক্ষণার অপূর্ব সংযোগ সাধিত হয়েছে। যে অবোধ মূক পশুর প্রতি করুণা দেখাতে গিয়ে বংশলোচনবাবু জীবন সম্পর্কে অর্থহীন নৈতিক-দার্শনিক বক্তৃতা দিয়েছেন, সেই ভাষাহীন পশুই শেষ পর্যন্ত প্রভুকে পরাভূত করেছে। দুর্যোগের রাতে লম্বকর্ণ বংশলোচনবাবুকে যেমন উদ্ধার করেছে, তেমনি প্রভুপত্নী মানিনী দেবীকে আসন্ন বুদ্ধিভ্রংশ থেকে রক্ষা করে প্রভুকেই বিপদমুক্ত করেছে।[২২] গল্পের পরিণতিতে লম্বকর্ণ প্রজ্ঞাবান হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে দেখা দিয়েছে দার্শনিকতাসুলভ নির্লিপ্তি। পরশুরাম তাই গল্পের উপসংহার টেনেছেন এইভাবে— "লোকে দূর হইতে তাহাকে বিদ্রূপ করে। লম্বকর্ণ গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিয়া যায়, নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে বলে— ব-ব-ব অর্থাৎ যতো কিছু হয় বকিয়া যাও, আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।"

গড্ডলিকা-র শেষ গল্প 'ভুশণ্ডীর মাঠে' ভৌতিক রচনা। এ গল্পে ভূত ও তাদের আচার-আচরণকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে হাস্যরসের নির্মল ধারা। হাস্যরসের গল্প হিসেবে 'ভুশণ্ডীর মাঠে' *গড্ডলিকা*-র শ্রেষ্ঠ রচনা। আলোচ্য গল্পে পরশুরামের কল্পনাশক্তি ও সৃজনপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ভূত-প্রেতের অলৌকিক কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠলেও 'ভুশণ্ডীর মাঠে' আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের গল্প বলেই মনে হয়। আলোচ্য গল্পে তিন প্রেতের মিলন ঘটেছে— ইহলোকে সংসারজীবনে যারা ছিল চরম অসুখী। অলৌকিক কাহিনীর মধ্যে বাস্তব জীবনের ছায়াপাতে আলোচ্য গল্প হয়ে উঠেছে অনন্য সৃষ্টি। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় প্রমথ চৌধুরীর অভিমত— "পরশুরামের ছবি আঁকবার হাত অতি পরিষ্কার। তিনি দু'চারিটি টানে এক একটি লোককে চোখের সুমুখে খাড়া করে দেন।...'ভুশণ্ডীর মাঠে'-র তুলনা নেই। এ ছবিটি আগাগোড়া কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু কি আশ্চর্যরকম রিয়ালিস্টিক।"[২৩] পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— "...তাঁর ভুশণ্ডীর মাঠে-র ভূতপ্রেতগুলোর ঠিকানা যেন আমার ভ্রমণ-বিবরণের মধ্যে কোথাও লেখা আছে।"[২৪] কল্পকাহিনী হলেও শিবুভূত, কারিয়া পিরেত, নেত্যকালী— এসব ভূত-প্রেত পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

শিবুভূত বাস্তবজীবনের দাম্পত্যযন্ত্রণা থেকে মুক্তি খুঁজেছে ডাকিনীর সঙ্গে প্রেম-উপলব্ধিতে। স্ত্রী নৃত্যকালীর যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্যই সে একের পর এক

প্রেত্নী বা ডাকিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। পরশুরামের অসামান্য বর্ণনায় শিবু-চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। যেমন, ডাকিনীর প্রতি তার আকর্ষণের বর্ণনা— "শিবুর মন সবচেয়ে হরণ করিয়াছে এক ডাকিনী। ভুশণ্ডীর মাঠের পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে ক্ষীরী-বামনীর পরিত্যক্ত ভিটায় যে জীর্ণ ঘরখানি আছে তাহাতেই সে অল্পদিন হইল আশ্রয় লইয়াছে। শিবু তাহাকে শুধু একবার দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে। ডাকিনী তখন একটা খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল। পরনে সাদা থান। শিবুকে দেখিয়া নিমেষের তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়াই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া যায়। কি দাঁত! কি মুখ! কি রং! নৃত্যকালীর রং ছিল পানতুয়ার মতো। কিন্তু ডাকিনীর রং যেন পানতুয়ার শাঁস।"

৩.২

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, পরশুরামের হাস্যরসের গল্পে কয়েকটি বিষয় বার বার ঘুরে-ফিরে এসেছে। সামাজিক ভণ্ডামি, ধর্মীয় বিশ্বাসে ফাটল এবং দাম্পত্যসংকট পরশুরামের রসসাহিত্যের পৌনঃপুনিক অনুষঙ্গ। *গড্ডলিকা*-র গল্পপঞ্চকেও আমরা উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে সামাজিক ভণ্ডামির ছবি চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ভণ্ডামি যে কত ভয়াবহ হতে পারে, শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়— এসব চরিত্রের কার্যাবলিতে আমরা তা লক্ষ করেছি। 'চিকিৎসা-সংকট' কিংবা 'মহাবিদ্যা' গল্পেও আছে এই ভণ্ডামির ছবি। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে তিনকড়ি বাবুকে প্রতারণার জন্য শ্যামানন্দের ভণ্ডামি—

> সে কি কথা! আপনার টাকা আপনারই থাকবে আর শত গুণ বাড়বে। এই দেখুন না— আমি আমার যথাসর্বস্ব পৈতৃক পঞ্চাশ হাজার টাকা এতে ফেলেছি। আমি না হয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, অর্থে প্রয়োজন নেই, লাভ যা হবে মায়ের সেবাতেই ব্যয় হবে। বিপিন আর এই অটল ভায়াও প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার ফেলেছেন। গণ্ডেরি এক লাখ টাকার শেয়ার নিয়েছে। সে মহা হিসেবী লোক— লাভ নিশ্চিত না জানলে কি নিত?

'চিকিৎসা-সংকট' গল্পে চিকিৎসার নামে তথাকথিত ডাক্তারের ভণ্ডামি— "দমে যাবেন না, তা হ'লে সারাতে পারব না। সাত দিন পরে ফের আসবেন। মাই ফ্রেন্ড মেজর গোঁসাই-এর সঙ্গে একটা কন্‌সল্‌টেশনের ব্যবস্থা করা যাবে। ভাত-ডাল বড় একটা খাবেন না। এগ ফ্লিপ, বোনম্যারো সুপ, চিকেন স্টু, এই সব। বিকেলে একটু বার্গন্ডি খেতে পারেন। বরফ-জল খুব খাবেন। হ্যাঁ, বত্রিশ টাকা। থ্যাঙ্ক ইউ।"

বোঝা যায়, বত্রিশ টাকার জন্যই ডাক্তার উদ্ভট সব ব্যবস্থা দিয়েছেন একজন সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষকে। 'মহাবিদ্যা' গল্পও ভণ্ডামির উপর প্রতিষ্ঠিত। গল্পের সমাপ্তি-অংশ উদ্ধৃত হলেই এই ভণ্ডামির ছবিটা স্পষ্ট ধরা পড়ে—

কাঙালীচরণ । দেবতা, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

জগদ্‌গুরু । তোমার আবার কি চাই? ব'লে ফেল।

কাঙালী । যদি কখনো মহাবিদ্যা ধরা প'ড়ে যায় তখন অবস্থাটা কি রকম হবে?

জগদ্‌গুরু । (ঈষৎ হাসিয়া বেদী হইতে নামিয়া পড়িলেন।)

ধর্ম এবং ধর্মবিশ্বাসের অনুষঙ্গে পরশুরামের গল্পে পৌনঃপুনিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে হাস্যরসের ফল্গুধারা। ধর্মের প্রতি কোনো বিশ্বাস নেই, অথচ মুখে ধর্মের দোহাই *গড্ডলিকা*-র গল্পগুলোর সাধারণ প্রবণতা। ধর্ম-ব্যবসা এবং ধর্ম নিয়ে ভণ্ডামি 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'লম্বকর্ণ', 'ভুশণ্ডীর মাঠে' প্রভৃতি গল্পে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুক সৃষ্টির প্রয়াস নিচের উদ্ধৃতিদ্বয়ে স্পষ্ট—

ক. শ্যামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন— 'তারা ব্রহ্মময়ী, তুমিই জান। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার কাজ তুমিই উদ্ধার ক'রে দাও মা— অধম সন্তানকে যেন মেরো না।' ('শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড')

খ. যথাস্থানে আসিয়া বংশলোচন জিলিপির ঠোঙাটি ছাগলকে খাইতে দিলেন। পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া তাহাতে লিখিলেন— এই ছাগল বেলেঘাটা খালের ধারে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। প্রতিপালন করিতে না পারায় আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিলাম। আল্লা কালী যিশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবেন না।
('লম্বকর্ণ')

গড্ডলিকা-র একাধিক গল্পে দাম্পত্যসঙ্কটের ছবি চিত্রিত হয়েছে। 'লম্বকর্ণ' এবং 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পে দাম্পত্যসঙ্কটের বিষময় পরিণতি হাস্যরস সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত, 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পে দাম্পত্যসঙ্কটই ঘটনার কেন্দ্রে অবস্থান করছে। এখানে যে তিন পুরুষ-প্রেতাত্মার কথা বলা হয়েছে, তাদের পারিবারিক জীবনে শান্তি ছিল না। তাদের স্ত্রীরা ছিল বন্ধ্যা, অতিশয় মুখরা— কেউবা আবার স্ত্রীর ঝাঁটার আঘাতেরও শিকার হয়েছে। নিচের উদ্ধৃতিপুঞ্জ থেকে শিবু, কারিয়া পিরেত ও নদের চাঁদের জীবনে দাম্পত্যসঙ্কটের ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যায়—

ক. শেয়ালদা হইতে সোজা কালীঘাটে গিয়া শিবু নানা উপচারে পাঁচ টাকার পূজা দিয়া মানত করিল— 'হে মা কালী, মাগীকে উলাউঠোয় টেনে নাও মা। আমি জোড়া পাঠার নৈবিদ্যি দেব। আর যে বরদাস্ত হয় না। একটা সুরাহা ক'রে দাও মা, যাতে আবার নতুন করে সংসার পাততে পারি। মাগীর ছেলেপুলে হ'ল না, সেটাও তো দেখতে হবে। দোহাই মা!' ('ভুশণ্ডীর মাঠে')

খ. কারিয়া পিরেত যে ইতিহাস বলিল তার সারমর্ম এই। —তাহার বাড়ি ছাপরা জিলা। দেশে এককালে তাহার জরু, গরু, জমি জেরাত সবই ছিল। তাহার স্ত্রী মুংরী অত্যন্ত মুখরা ও বদমেজাজী, বনিবনাও কখনো হইত না। একদিন প্রতিবেশী ভজুয়ার ভগ্নিকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিষম ঝগড়া হয়, এবং স্ত্রীর পিঠে এক ঘা লাঠি কশাইয়া স্বামী দেশ ছাড়িয়া কলকাতায় চলিয়া আসে। ('ভুশণ্ডীর মাঠে')

গ. যক্ষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন— 'সব সুখ কি কপালে সয় রে দাদা। ঘর-সংসার সবই তো ছিল, কিন্তু গিন্নীটি ছিলেন খাণ্ডার। ('ভুশণ্ডীর মাঠে')

—কাজেই দেখা যাচ্ছে, সবার জীবনেই দাম্পত্যসঙ্কট বিষময় অবস্থা সৃষ্টি করেছে। যক্ষের সংলাপেও সেকথা ব্যক্ত হয়েছে— 'সব স্যাঙাতের একই হাল দেখছি।' এই দাম্পত্যসঙ্কটই আলোচ্য গল্পে নির্মল হাসির ফোয়ারা সৃষ্টি করেছে। গল্পের উপসংহারে সে-কথাই লেখক ব্যক্ত করেছেন— "তারপর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা মনে করিলেও কলমের কালি শুকাইয়া যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী— এই ডবল ত্র্যহস্পর্শযোগে ভুশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হইল। ভূত, প্রেত, পিশাচ, তাল, বেতাল প্রভৃতি উপদেবতা যে যেখানে ছিল, তামাশা দেখিতে আসিল। স্পুক, পিক্সি, নোম, গরলিন প্রভৃতি গোঁফ-কামানো বিলাতি ভূত বাঁশি বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। জিন, জান, আফ্রিদ, মারীদ্ প্রভৃতি লম্বা-দাড়িওয়ালা কাবুলী ভূত দাপাদাপি আরম্ভ করিল। চিং চ্যাং, ফ্যাংচাং ইত্যাদি মাকুন্দে চীনে ভূত ডিগবাজি খাইতে লাগিল।"

৪

গড্ডলিকা গ্রন্থে অন্তর্ভূত গল্পপঞ্চকে পরশুরামের ভাষা-ব্যবহার, বর্ণনামূলক পরিচর্যা এবং পটভূমি-নির্মাণে দক্ষতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। কল্পনার ঐশ্বর্য পরশুরামের প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাষার অন্তর্স্রোতে অবলীলায় তিনি সঞ্চার করেছেন হাসির ফোয়ারা। *গড্ডলিকা* গ্রন্থ থেকে উজ্জ্বল কিছু নমুনা পরশুরামের বর্ণনামূলক পরিচর্যা ও ভাষাচেতনার স্বাক্ষর হিসেবে উপস্থাপন করা যায়—

ক. বংশলোচনের বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড় ও সুসজ্জিত; অর্থাৎ অনেকগুলি ছবি, আয়না, আলমারি, চেয়ার ইত্যাদি জিনিসপত্রে ভরতি। প্রথমেই নজরে পড়ে একটি কার্পেট বোনা ছবি, কাল জমির উপর আসমানী রঙের বিড়াল। যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং বিড়ালটির এই দশা হইয়াছে। ছবির নিচে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বড় বড় ইংরেজি অক্ষরে লেখা আছে— CAT। তার নিচে রচয়িত্রীর নাম— মানিনী দেবী। ('লম্বকর্ণ')

খ. মনে পড়িল— ভুশণ্ডীর মাঠের প্রান্তস্থিত পিটুলি বিলের ধারে শ্যাওড়া গাছে একটি পেত্নী বাস করে। শিবু তাহাকে অনেকবার সন্ধ্যাবেলা পলো হাতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছে। তার আপাদমস্তক ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা, একবার সে ঢাকা খুলিয়া শিবুর দিকে চাহিয়া লজ্জায় জিভ কাটিয়াছিল। পেত্নীর বয়স হইয়াছে, কারণ তাহার গাল একটু তোবড়াইয়াছে, সামনের দুটো দাঁত নেই। তাহার সঙ্গে ঠাট্টা চলিতে পারে, কিন্তু প্রেম হওয়া অসম্ভব। ('ভুশণ্ডীর মাঠে')

পরশুরাম কখনো কখনো অসামান্য নৈপুণ্যে প্রকৃতির ব্যবহার করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পে শিবুভূতের নতুন বিয়ে-বাসনা প্রসন্ন প্রকৃতির বর্ণনায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে— "ফাল্গুন মাসের শেষবেলা। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝিরঝির করিয়া বহিতেছে। সূর্যদেব জলে হাবুডুবু খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। ঘেটুফুলের গন্ধে ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে। ...একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্মশরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। ...শিবুর যদিও রক্তমাংসের শরীর নাই, কিন্তু মরিলেও স্বভাব যাইবে কোথা। শিবুর মনটা খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিল, সেখানটা ভরাট হইয়া ধড়াক ধড়াক করিতে লাগিল।"

গড্ডলিকা-র অন্তত এক জায়গায় পরশুরামের পরিচর্যায় মগ্নচেতনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। লম্বকর্ণকে ছেড়ে দিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়ের সময় বংশলোচনবাবুর বিপন্ন ভাবনা মগ্নচেতনাপ্রবাহরীতির আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়েছে এভাবে—

> ... গাছপালা শিহরিয়া উঠিল, লম্বা লম্বা তালগাছগুলা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। কাকের দল আর্তনাদ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝাপটা খাইয়া আবার গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিল। প্রচণ্ড ঝড়, প্রচণ্ডতর বৃষ্টি। যেন এই নগণ্য উইটিবি— এই ক্ষুদ্র কলিকাতা শহরকে ডুবাইবার জন্য স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতা সারি বাঁধিয়া বড় বড় ভৃঙ্গার হইতে তোড়ে জল ঢালিতেছেন। মোটা নিরেট জলধারা, তাহার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ফোঁটা। ('লম্বকর্ণ')

—বংশলোচনবাবুর বিপর্যস্ত ভাবনা এবং লম্বকর্ণের জন্য দুশ্চিন্তা উপর্যুক্ত বর্ণনায় অব্যর্থভাবে প্রকাশিত।

৫

বাংলা রম্যসাহিত্যের ধারায় পরশুরামের *গড্ডলিকা* এক উজ্জ্বল নির্মাণ। তাঁর রচনায় হিউমার, স্যাটায়ার আর উইটের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে।[২৫] *গড্ডলিকা*-র গল্পগুলো বাস্তবজীবনের নানা খণ্ডচিত্র নিয়ে নির্মাণ করেছে হাস্য-কৌতুক ও রঙ্গ-ব্যঙ্গের নির্মল ঝর্ণাধারা। পরশুরামের কালে যেমন তাঁর সমকক্ষ কোনো লেখক ছিলেন না, তেমনি উত্তরকালেও তিনি আছেন অনতিক্রান্ত। গল্পের বিষয়নির্বাচন, চরিত্রচিত্রণ, ভাষা-ব্যবহার—প্রভৃতি অনুষঙ্গেই একথা অনস্বীকার্য। পরশুরামের সাহিত্য-মূল্যায়নে কলকাতার *The Amrita Bazar Patrika*-র সত্যস্পর্শী অভিমত এখানে উল্লেখ করে আলোচনার সমাপ্তি টানা যায়—

> The author's characters are, each one of them veritable masterpieces. They live before our very eyes ....Stories like these are seldom to be found. They do honour not only to their gifted writer but also to the language in which they are written. If anything has appealed to us particularly, it is, the author's vigorous originality of conception and mastery over the style he wields.[২৬]

তথ্যসঙ্কেত

১. মতান্তরে রাজশেখর বসুর জন্মতারিখ ১৮৮০ সালের ১৮ই মার্চ, বৃহস্পতিবার বলেও কোনো কোনো সমালোচক উল্লেখ করেছেন।

২. কল্যাণী ঘোষ, *রাজশেখর বসু : জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., ১৯৮৩), পৃ. ৯৫

৩. উদ্ধৃত— কল্যাণী ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

৪. দীপেন সাহা, *রাজশেখর বসু : জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জি* (কলকাতা : সাহিত্যশ্রী, ১৯৮১), পৃ. ৪৭

৫. বুদ্ধদেব বসু, "রাজশেখর বসু", *সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ* শীর্ষক গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ (কলকাতা : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩), পৃ. ৯২

৬. গুরুদাস ভট্টাচার্য, "রাজশেখর বসু", *যষ্টিমধু*, বৈশাখ ১৩৬৭, কলকাতা।

৭. Buddhadeva Bose, *An Acre of Green Grass* (Calcutta : Papyrus, reprint–1982), pp. 100-01

৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "রসরাজ পরশুরাম", *মানসী ও মর্ম্মবাণী*, ভাদ্র ১৩৩২, কলকাতা।

৯. বুদ্ধদেব বসু, *সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭

১০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ সংস্করণ-১৯৭৩), পৃ. ৪০৭

১১. নূরুর রহমান খান, *মুজতবা-সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য ও রচনাশৈলী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯০), পৃ. ১৬৮

১২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* (কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৬), পৃ. ৫৬৪

১৩. অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা* (কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বি. সং. ১৯৬৮), পৃ. ৫৯

১৪. অজিতকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৯

১৫. অজিত দত্ত, *বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস* (কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা. লি., দ্বি. সং.-১৯৭৩), পৃ. ৬৬

১৬. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্য ও সাহিত্যিক* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, সং ১৯৮৭), পৃ. ১২৭

১৭. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *হাস্যরসিক পরশুরাম* (কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা. লি., ১৩৮৬), পৃ. ২০

১৮. পরশুরাম, *গড্ডলিকা* (কলকাতা : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টাদশ সংস্করণ-১৩৯২) পৃ. ৮। বর্তমান রচনায় *গড্ডলিকা* গ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ উপর্যুক্ত গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

১৯. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *হাস্যরসিক পরশুরাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

২০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১০

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

২২. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *হাস্যরসিক পরশুরাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

২৩. উদ্ধৃত— কল্যাণী ঘোষ, *রাজশেখর বসু : জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

২৪. উদ্ধৃত— কল্যাণী ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

২৫. জ্যোৎস্না গুপ্ত, *পরশুরামের গল্প : মন ও শিল্প* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, সং. ১৯৮৯), পৃ. ২১

২৬. *The Amrita Bazar Patrika*, Calcutta, 17. 04. 1934.